অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 225-233
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.032

MAROYARI SAMPRODAY O NOBBO BANKURAR BIKASH / মাড়োয়ারী সম্প্রদায় ও 'নব্য বাঁকুড়া'র বিকাশ

DR. SOVAN GHOSAL / ড. শোভন ঘোষাল
প্রাক্তন গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী শিক্ষক, বামুনতোড় হাইস্কুল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Email: sovanghosalbu@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
এক্তেশ্বর গোশালা, বাঁকুড়া, মধ্যবিত্তশ্রেণী, মাড়োয়ারী, মোহনলাল গোয়েঙ্কা।

Abstract:

উনবিংশ শতকে বাঁকুড়া নামক ছোট্ট শহরটির উদ্ভবের ক্ষেত্রে প্রধান বিশেষত্ব হল বিষ্ণুপুরের মত ঐতিহ্যশালী কেন্দ্রকে পিছনে ফেলে মূলত অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে একটি শহরের পত্তন। একটি নব্য মফঃস্বল শহর হিসেবে বাঁকুড়ার উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যই মুখ্য ভূমিকা গ্রহন করেছিল। নয়াবাঁকুড়ার বিকাশের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বিদেশীয় মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাঁকুড়া শহর তথা সমগ্র জেলার উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের ভূমিকার বিষয়টি এবং বর্তমানকাল অবধি বাঁকুড়াজেলার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রে জেলার স্থানীয় মানুষদের সাথে 'বিদেশী' মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের অন্তসম্পর্কটি বিশ্লেষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Discussion:

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে 'বাঁকুড়া' জঙ্গলমহল জেলার স্থায়ী সদর কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সময় শহরটি ছিল খুবই জনবিরল।[১] সেইসময় এই এলাকার ব্যাবসা বানিজ্যের বিষয়টি ছিল একান্তই অপাংক্তেয়। প্রশাসনিক একক হিসেবে বাঁকুড়া জেলা গঠনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ। জেলার দুই প্রধানকেন্দ্র বাঁকুড়া ও মল্লযুগের রাজধানী বিষ্ণুপুর এর মধ্য বাঁকুড়াকেই জেলার সদরদফতর করে তোলা হয়। ক্রমশ বাঁকুড়া শহর হয়ে উঠে জেলার প্রাণকেন্দ্র। এইসময় থেকেই জেলার এই সদর কেন্দ্র ব্যবসা বাণিজ্যের ভারকেন্দ্রে পরিণত হয়। জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়ায় আভ্যন্তরিন বাণিজ্যের বিকাশ ও রোজকারের নতুন সম্ভাবনার আকর্ষনে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষজন বাঁকুড়ায় আসতে শুরু করে। তেমনি একটি বহিরাগত সম্প্রদায় হিসেবে বাঁকুড়ায় মাড়োয়ারীদের আগমন ঘটেছিল। জীবিকার সন্ধানে আশা এই সম্প্রদায় খুব অল্পসময়ের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে ও 'নব্য বাঁকুড়া'র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রাক ঔপনিবেশিক কাল থেকেই মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, প্রভৃতি স্থানে মাড়োয়ারী শেঠদের আগমনের প্রমান মেলে। অষ্টাদশ শতকে জগত শেঠ এর কার্যকলাপ আর গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। মোটামুটিভাবে ১৮৭০-র দশক থেকে বাঁকুড়ায় মাড়োয়ারীদের আগমন ঘটেছিল বলে মনে করা হয়।[২] রাজস্থানে অবস্থিত মধ্যবর্তী আরাবল্লী পর্বত শ্রেণীর উপরের দিকে অবস্থিত ব্রুসলিয়া অঞ্চলের পাশে জয়সালমীর, যোধপুর, পালী, বিকানী নিয়ে গঠিত অঞ্চল মারবাড় নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের মাড়োয়ারী বলা হয়। মূলত জীবিকার অন্বেষনে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর 'ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি' গ্রন্থে টম টীমবার্গের গবেষনা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, আঠারো শতকের আগেই মাড়োয়ারী ব্যাবসায়ীরা সুরাট-দিল্লী- আগ্রা বাণিজ্য পথের মাধ্যমে রাজপুৎ সামন্ত রাজাদের মহাজন হিসেবে কিম্বা সৈনবাহিনীর সরবরাহকার হিসেবে ব্যবসা করতেন। আগ্রা-দিল্লীর আধিপত্যের অবসান ও সুরাট বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে যখন আর রইলনা তখন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা দাক্ষিণাত্য ও গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে ব্যবসা করতে শুরু করে।

ভারতের পূর্ব অংশ, বিশেষত কলকাতা, আসাম, আসানসোল, মণিপুর, শিলিগুড়ি, মেঘালয় এবং বাঁকুড়াতেও তারা বসতি স্থাপন করে ব্যবসা বাণিজ্য করেছে। এই সমস্ত জায়গাতেই মাড়োয়ারীরা বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের মধ্য নিজেদের স্থান বানিয়ে নিয়েছে। বাঁকুড়ায় মাড়োয়ারীদের বেশিরভাগই এসেছিলেন রাণীগঞ্জ থেকে। তবে কিছু কিছু পরিবার রাজস্থান থেকে সরাসরি এসে বাঁকুড়ায় বসতি স্থাপন করেন। বাঁকুড়া মেজিয়া- রাণীগঞ্জ সড়ক তৈরী হওয়ার খোট্টা, দেহাতী ও মাড়োয়ারী ব্যপারীরা বরাকর ও রাণীগঞ্জ থেকে বাঁকুড়া শহরে এসেছিল।[৩] বাঁকুড়া জেলায় মাড়োয়ারী বসতি স্থাপনের প্রথম তথ্যভিত্তিক নিদর্শন পাওয়া যায় উইলিয়াম হান্টারের গ্রন্থে। তিনি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় ৭০ জন মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সেন্সাস রিপোর্টে বাঁকুড়ায় স্বল্প সংখ্যক মাড়োয়ারী ব্যাবসায়ীর আগমনের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[৫] অবশ্য খুব অল্প সময়ের মধ্যই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের মতে রাজস্থানের বিকানীর জেলার দেশনোক গ্রাম থেকে মহেশ্বরী সম্প্রদায়ভুক্ত রাঠী পরিবার সর্বপ্রথম বাঁকুড়ায় এসেছিলেন।[৬] রাঠী পরিবারের এখানে আসার প্রধান কারন ছিল ব্যাবসা বাণিজ্য। বাঁকুড়ায় আগমনের আগে তাদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল রাণিগঞ্জে। সেখান থেকে শুকদেব ও অনন্তরাম নামে দুই রাঠী ভ্রাতা বাঁকুড়ায় এসেছিলেন ব্যবসায়িক ভাগ্যান্বেষণে।[৭] তবে তাদের আগমনের সময়কাল নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ মনে করেন ১৮৬০-৭০ এর দশকে তাদের আগমন ঘটেছিল। বলা

হয় যে এই দুই রাঠী ভ্রাতা বাঁকুড়ার বড়োবাজারের সত্যপীরতলার পাকা রাস্তার দুপাশে দুজন দুটি পৃথক দোকান খোলেন। শুকদেব রাঠী রাস্তার উত্তরদিকে কাপড়ের দোকান ও অনন্তরাম রাঠী রাস্তার দক্ষিণদিকে সুতোর দোকান করে ব্যবসা শুরু করেন।[৮] তাদের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা নিজ নিজ পুর্বপুরুষদের ব্যবসা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে রাঠী পরিবারের একটি অংশ বিষ্ণুপুরে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন।[৯]

দারুকা, খান্ডেলওয়াল, সেলামপুরিয়া, সুহাসারিয়া পদবীধারী ব্যবসায়ীরা পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে বাঁকুড়ার ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণগত ও প্রকৃতিগত সম্প্রসারণ ঘটায়। বাঁকুড়ায় বাজোরিয়া পরিবারের আগমন ঘটেছিল আনুমানিক ১৮৯০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে। প্রথম এসেছিলেন নরমল বাজোরিয়া। তিনি এসেছিলেন রাজস্থানের রতনগড় থেকে। প্রায় একইসময়ে রাণীগঞ্জ থেকে এসেছিলেন রামরেখদাস দারুকা ও ওঙ্কারনাথ খান্ডেলওয়াল। এরপর রাণীগঞ্জ থেকেই আগমন ঘটেছিল সেলামপুরিয়া ও সুহাসাসরিয়া পরিবারগুলি। অবশেষে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রাজস্থানের বিকানীর জেলার চুরু থেকে ব্যবসার জন্য বাঁকুড়ায় আসেন জয়দায়াল গোয়েঙ্কা ও তাঁর ভাই মোহনলাল গোয়েঙ্কা।[১০] বাঁকুড়ায় পীরতলা মোড়ে হরদয়াল সাগরমল, রাসতলা সংলগ্ন এলাকায় নেউলরাম ও তাঁর ভাই ছটুবাবু এসে ব্যবসা শুরু করেন। ক্রমশ চনুরাম আশারাম, রামেশ্বর লাল, বদ্রীপ্রসাদ, পিরামল রামজীবন প্রমুখরা বরাকর থেকে এসে লালবাজারের কাছে ব্যবসা শুরু করেন।[১১] বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে ক্রমশ মাড়োয়ারী বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাণীগঞ্জ, বরাকর, আসানসোল প্রভৃতি ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলির সাথে বাঁকুড়া শহরের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এর রচনায় একজন মাড়োয়ারী ফেরিওয়ালার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার নাম ঘাঁসিরাম। যিনি পাঁপড় ভাজা, মসলাদার ডালমুট, ছোলা মটর, কলাইভাজা ও চাটনী ফেরি করতেন। ঘাঁসিরামের ছেলে নাথমল জেঠিয়ার লালবাজার অঞ্চলে ও শহরের অন্যস্থানে আরো একটি বড় আড়ত খুলেছিল।[১২] নরমল বাজোরিয়া ও তাঁর পুত্র শিউবক্স বাঁকুড়া ও সংলগ্ন এলাকায় কেরোসিন ফেরি করতেন। পরবর্তীকালে বাজোরিয়া পরিবার অত্যন্ত ধনবান হয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে নরমল বাজোরিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা স্থায়ী আমানত জমা দিয়ে বাঁকুড়া জেলায় বার্মাশেল কোম্পানীর একমাত্র ডিলারশিপ লাভ করেছিলেন।[১৩] এই দুই ঘটনা সমকালীন বাঁকুড়ায় মাড়োয়ারীদের ক্রম ব্যবসায়িক আধিপত্য স্থাপনের একটি গুরুত্বপুর্ণ উদাহরণ।

বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে কোলকাতার পরেই ছিল রাণিগঞ্জের স্থান। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বসবাসের সময় মাড়োয়ারীরা সেখানে হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন করতেন।[১৪] 'হুন্ডি' হল, মোঘল আমলে বিকশিত একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থ লেনদেন পত্র। বাঁকুড়ায় আসার পর মাড়োয়ারীরা সেই ব্যবস্থাটিকে এখানে নিয়ে আসেন। শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মাড়োয়ারীরা তেমন উৎসাহ না দেখালেও, মোহনলাল গোয়েঙ্কা গেঞ্জি কারখানা স্থাপন করে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মাড়োয়ারীদের জমিদারী ব্যবসায় আগ্রহ ছিল। কারন এইধরনের ব্যবসা ছিল ঝুঁকিবিহীন আয়ের উৎস এবং এর পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদার সূচক। হরিকিষেন রাঠী ছিলেন একজন পত্তনীদার। তাঁর পত্তনী জমির অন্তর্ভুক্ত হরিপুর লাট, চুয়ামসিনা, রাধানগর, ইছারিয়া ও লায়েক বাঁধ জঙ্গল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এইসময়ে বাঁকুড়া শহর ছিল রানীগঞ্জের রামবল্লভ মাড়োয়ারীর পত্তনীভুক্ত।[১৫] মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের আগমনের ফলে বাঁকুড়ার ব্যবসা-বাণিজ্যে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান এমনকি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।[১৬] ব্যবসাবাণিজ্যের ভৌগলিক সম্প্রসারণের সঙ্গে আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের তালিকাও বৃদ্ধি পায়। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় আমদানী দ্রব্যের মধ্য ছিল- বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে চাল। কোলকাতা থেকে জাভা চিনি, মিছরি, কেরোসিন তেল, লবন, কাগজ এবং পেস্তা, কিসমিসের মত শুকনো ফল প্রভৃতি। বিহার থেকে পেঁয়াজ, আলু, ডাল।[১৭] ১৯২০-র দশকে ধান, চাল, রেশম বস্ত্র ও কাঠের

রপ্তানী বাণিজ্য এবং সুতো ব্যবসা ছিল মাড়োয়ারীদেরই কুক্ষিগত। সেইসময় যে সব ব্যাবসায়ীরা কারখানাজাত সুতা আমদানী করতেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ভুক্ত। হরিকিষেণ রাঠী একাই সাতলক্ষ টাকা মূল্যের সুতো আমদানী করতেন। সুতো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ছিলেন জিতমল, নরমল শিউবক্স, দেওকীদাস ফুলচাঁদ ও পূর্ণচন্দ্র রক্ষিত। লবন, চিনি, ও মসলার ব্যবসায়ে লিপ্ত বাঁকুড়ার তেত্রিশজন ব্যবসায়ীর মধ্যে একত্রিশ জন ছিলেন মাড়োয়ারী।[১৮]

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বাঁকুড়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছিলেন। হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের গুরত্বপুর্ণ অংশগ্রহন ছিল। যেমন পশু হাসপাতালের পরিচালনার সভার অন্যতম সদস্য হিসেবে হরিকিষেণ রাঠীকে মনোনীত করা হয়েছিল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি জেলা বোর্ড পরিচালিত ভেটেনারী ডিসপেনসারি হাসপাতালে উন্নীত হয়েছিল। এছাড়াও ওঙ্কারনাথ মাড়োয়ারী ছিলেন একজন পৌর কমিশনার।[১৯] বৃহত্তর সামাজিক লোক সম্পর্কের ফলেই তাদের পক্ষে পৌরসভা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ মাড়োয়ারীরা শুধুমাত্র ব্যবসাতেই আধিপত্য স্থাপন করেনি, ধীরে ধীরে সামাজিক প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পায় তাদের সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে।

বাঁকুড়ার সামাজিক ক্ষেত্রে মাড়োয়ারীরা যে সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছিল তাঁর মধ্যে অন্যতম হল বাঁকুড়া ধর্মশালা নির্মান। এইরকম কর্মসূচি মাড়োয়ারীদের পূর্বে বাঁকুড়ার মানুষদের মধ্যে দেখা যায়নি। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী হরকিষেণ রাঠী ও নরমল বাজোরিয়ার মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির মাধ্যমে 'বাঁকুড়া ধর্মশালা' নির্মিত হয়। বর্তমান বাঁকুড়ার নূতনগঞ্জ অঞ্চলে এই ধর্মশালা নির্মিত হয়। এর জন্য জমিদান করেছিলেন রাঠীরা এবং নির্মানের অর্থদান করেছিল বাজোরিয়ারা। এই ধর্মশালাটি একসময় বাঁকুড়ার সভা সমতি ও সম্মেলনের প্রধান স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হত। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বাঁকুড়া ধর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁকে মাসখানেকের জন্য তাকে অন্তরীন রাখা হয়। মুক্তি পেয়ে বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় ফিরে যাবার দিন বাঁকুড়ায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাঁকুড়া ধর্মশালায়।[২০] এটাই ছিল জাতীয় জীবনে ধর্মশালার এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত ও বাঁকুড়ায় মাড়োয়াড়ী সম্প্রদায়ের সামাজিক জাতীয় স্বীকৃতি।

বাঁকুড়া জেলায় মাড়োয়ারীদের দ্বারা নির্মিত অপর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল এক্তেশ্বর গোশালা নির্মান। হরিকিষেণ রাঠীর উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে এই গোশালা তৈরী করা হয়েছিল জগন্নাথবাটী মৌজায়। তিনি ছিলেন এই গোশালা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে তিনি আসীন ছিলেন। ১৯৩৬ সালে গোশালাটি জগন্নাথবাটি থেকে কেশিয়াকোলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় গোশালা কমিটির সম্পাদক ছিল মোহনলাল গোয়েঙ্কা। ১৯২৫ সালে গোশালার বার্ষিক আয়ের পরিমান ছিল কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা।[২১] এই আয়ের উৎস ছিল আমদানী-রপ্তানী বাবদ আদায়ীকৃত বিশেষ 'বৃত্তি'। প্রতিষ্ঠানের কমিটির সদস্যরা বাৎসরিক মিটিং এর মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন।[২২] গোসেবা ও গোসংরক্ষন মাড়োয়ারী ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। সনাতনী ভাবধারা প্রভাবিত বাঁকুড়ায় গো-সেবা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবেই বিবেচিত। প্রতিষ্ঠানের অর্থ ঘাটতির সমস্তটাই মাড়োয়ারীরাই পূরণ করত।[২৩]

বাঁকুড়া জেলার শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের ভূমিকা উজ্জ্বল। জেলাবোর্ডের নথি থেকে জানা যায় যে, নয় বছর বয়স্ক জানকীনাথ মাড়োয়ারী নামে এক বালক ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে ছাতনা কায়স্থপাড়া পাঠশালা

থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় ছাত্র বৃত্তি লাভ করেছিলেন। ফুলচাঁদ খান্ডেলওয়াল বাঁকুড়ায় মাড়োয়ারীদের মধ্যে প্রথম বি.এ. পাশ করেন। মাড়োয়ারীদের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল।[২৪] মোহনলাল গোয়েঙ্কা ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে বাঁকুড়া শহরে ও শহর সংলগ্ন মধুবনে এবং ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যে ইন্দপুর ও হরিগ্রামে মোট চারটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[২৫] স্বাধীনোত্তর কালেও বিদ্যালয়গুলি গোয়েঙ্কা ট্রাষ্টের অর্থে পরিচালিত হত। মধুবন, ইন্দপুরে উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হবার ফলে আদিবাসীদের সামনেও শিক্ষার সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। শিক্ষা বিস্তারে বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা উচ্চবিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই বিদ্যালয়টির হলঘরের দেওয়ালে গীতার শ্লোক উৎকীর্ণ করা হয়।[২৬] ভারতীয় সংস্কৃতির বাতাবরনে পরিশীলিত উচ্চশিক্ষা বিতরনে প্রয়াসী হয়েছিলেন মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গরা। হরিকিষেন রাঠী ছিলেন বাঁকুড়ার সারস্বত সমাজের পৃষ্ঠপোষক। ১৯২০ র দশকের গোড়ার দিকে তিনি স্থাপন করেছিলেন নৃসিংহ টোল। বিশাল এলাকা জুড়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠগৃহ, গুরুনিবাস ও ছাত্রাবাস গড়ে উঠে ছিল। এই টোলের প্রথম অধ্যাপক ছিলেন অনঙ্গভূষন গোস্বামী। এই টোলের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতেন এই রাঠী পরিবার। সংস্কৃত শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতায় রাঠীদের বদান্যতা তুলনাহীন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সারস্বত সমাজের তত্ত্বাবধানে বাঁকুড়া শহরে সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হলে বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করত রাঠী পরিবার।[২৭] সারস্বত সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিচালনায় তাঁরা বিশেষ হস্তক্ষেপ করতেন না, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের ব্যায়ের সিংহভাগ বহন করছিলেন হরিকিষেণ দাস রাঠী।

ঔপনিবেশিককালে ভারতের বেশীরভাগ অঞ্চলের মতোই বাঁকুড়াজেলা ছিল অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়েপড়া একটি অঞ্চল। তাই দুর্ভিক্ষ–আকাল-মহামারী ছিল এখানকার মানুষদের নিত্যসঙ্গী। জেলার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা এইধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় একমাত্র বাঁকুড়া শহরেই লঙ্গরখানা পরিচালনার জন্য গোয়েঙ্কা ট্রাষ্ট তিন লক্ষ টাকা ব্যায় করেছিলেন। এই সময় গোয়েঙ্কারা সমগ্র জেলায় ১৫০টি ত্রাণ শিবির স্থাপন করেছিলেন। এইসব কেন্দ্রে কোন ব্যাক্তি চার ঘন্টা নাম কীর্তণ করলেই পাঁচ ছটাক চাল ও ডাল পেতেন। এইভাবে শত শত ব্যাক্তি রোজ ত্রাণকেন্দ্র গুলি থেকে আহার্য পেতেন।[২৮] দ্বারকাদাস ফুলচাঁদ দুর্ভিক্ষে পীড়িতদের ত্রাণের জন্য লঙ্গরখানা খুলেছিলেন। বাজোরিয়ার পরিবার ও এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। বেনিপ্রসাদ খান্ডেলওয়াল পরিবার ও প্রভূত অর্থব্যয় করেছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তিকালেও অনাবৃষ্টিজনিত অন্নাভাবের সময়েও গোয়েঙ্কা ট্রাষ্ট, খান্ডেলওয়াল ট্রাষ্ট ত্রাণ কার্যে এগিয়ে এসে সামাজিক দ্বায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকাও ছিল লক্ষ্যনীয়। মোহনলাল গোয়েঙ্কা ১৯৪২-৪৭ সাল পর্যন্ত বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সহসভাপতি ছিলেন। গঙ্গাধর রাঠীও ছিলেন এই মিশনের অন্যতম সদস্য।[২৯]

বাঁকুড়া জীবনে মাড়োয়ারীরা বোধহয় সবচেয়ে বেশী অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের সময় জনৈক অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী বাঁকুড়া ধর্মশালায় এসে অবস্থান করছিলেন। রাঠী পরিবার তাকে সমস্ত রকম সহায়তা করেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন কোন জাতীয়তাবাদী নেতা, যিনি এখানে আত্মগোপন করেছিলেন। এইসময় হরকিষেণ রাঠী, তাঁর ভাই শিউরতন রাঠী এর উদ্যোগে এবং গোপীনাথ দত্ত, ভোলানাথ দত্ত, যুগল মল্লিক প্রমুখ ব্যবসায়ীদের সহযোগীতায় বাঁকুড়ার দোলতলায় একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় সভাপতি হন অনিলবরন রায়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রদের নিয়ে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে বাঁকুড়ায় সরাসরি অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। কলেজে ধর্মঘটের কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়। এই অবস্থায় হরকিষেণ রাঠী নিজ উদ্যোগে নূতন গঞ্জ এলাকায় একটি বড় বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় অসহযোগী ছাত্রদের থাকার- খাওয়ার ব্যবস্থা

করে দেন। এই সময়েই জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলে হরিকষেণ রাঠী এবং সম্পাদক হন অনিলবরন রায়।

বাঁকুড়ার জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে মোহনলাল গোয়েঙ্কা ছিলেন একজন বিশেষ ব্যাক্তিত্ব। ১৯২৭ সালে তিনি সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কোলকাতা অধিবেশনে ও ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে তিনি খাদিবস্ত্রের বিপণন কেন্দ্র খুলেছিলেন। বাঁকুড়ার প্রবাদপ্রতিম কংগ্রেস নেতা গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের অনুরোধে মোহনলাল গোয়েঙ্কা জেলায় খদ্দর প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহন করেন। খাদি উৎপাদনের জন্য কুড়ি হাজার টাকা লগ্নি করে তিনি ইন্দপুরে একটি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৩০ সালে মোহনলাল গোয়েঙ্কা বড়জোড়ায় একটি জনসভা করে গ্রেফতার হন। কারামুক্ত হবার পর তিনি গঠনমূলক কাজে ব্রতী হন। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তহবিল গঠনের জন্য বাঙলার ছোটলাট লিটন বাঁকুড়ায় এলে যুদ্ধবিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। মোহনলাল গোয়েঙ্কা ছিলেন এই বিক্ষোভ সমাবেশের মূল উদ্যোক্তা। এজন্য তিনি গ্রেপ্তার হন, যদিও একদিন পরেই মুক্তি পান। মোহনলান গোয়েঙ্কা ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময়েও ছাত্র সমাজ কে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৩০]

বাঁকুড়া জেলায় মাড়োয়ারীরা ছিলেন বহিরাগত, তাই এই বহিরাগত ধনবানদের সম্পর্কে জেলার মানুষ, বিশেষত স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কীভবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল সেই বিষয়টি দেখা প্রয়োজন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মাড়োয়ারীদের আধিপত্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে স্থানীয় বাঙালী ব্যবসায়ীদের আধিপত্য সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছিল। সুদূর রাজস্থান থেকে এসে বাংলায় ধনবান হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় দের প্রভাব কে ক্রমশ সঙ্কুচিত করছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৩২৬ বঙ্গাব্দে, "বাঁকুড়ার পত্র"তে বলেছেন যে, এ জেলার একটি বড়ো অংশ কৃষির পক্ষে অনুপযুক্ত, আর মানুষের হাতে তাঁর প্রতিকারের মতো পুঁজি বা জ্ঞান কোনটিই ছিল না। এইরকম পরিস্থিতিতে সেখানে দৃষ্টিহীন, বলহীন, খাদ্য আধপেটাভাবে খেয়ে জীবনধারন করছে সাধারন মানুষ। সেই পরিস্থিতিতে যেটুকু আছে সেই ধনেও মাড়োয়ারীরা এসে ভাগ বসায়। ফলে স্থানীয় বাঙালীদের মধ্যে 'ঈর্ষানল' জ্বলে উঠবে এটা স্বাভাবিক বিদেশী (মাড়োয়ারী) এসে বাঁকুড়ার ধনে ভাগ বসাবে আবার অন্যদিকে যে মরুদেশ থেকে মাড়োয়ারীরা আসছে সেখানে কিন্তু বাঙালীদের চাকরির প্রত্যাশা নেই।[৩] এই ধরনের মন্তব্য বাঁকুড়ার স্থানীয় মানুষের মাড়োয়ারী সম্পর্কে ধারনার একটি বাস্তব উদাহরণ। বাঙালীর আলস্য ও ঔদাসীন্য মনোভাবের জন্য মাড়োয়ারীরা প্রায় সমস্ত রকমের ব্যবসাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে নিতে শুরু করে। আড়তদারী ব্যবসা থেকে শুরু করে কাঠের মালা, সূতিবস্ত্র, ধান ও চালের ব্যবসা সমস্ত কিছু, যেগুলিতে স্থানীয় বাঙালী ব্যবসায়ীদের আধিপত্য ছিল ধীরে ধীরে সেই আধিপত্য মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা গ্রাস করে নেয়। শুধুমাত্র বড়ো ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রেই নয় স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কুটিরশিল্প ক্ষেত্রেও মাড়োয়ারীরা ভাগ বসিয়েছিল। বাঁকুড়ার বহু পল্লীগ্রামে তুলসী, বেল ও কাঠির মালা তৈরি হত। মূলত ধর্মীয় কাজের জন্য পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এই মালার চাহিদা ছিল। মালা প্রস্তুতকারকরা এই মালা মাড়োয়ারীদের কাছে বিক্রয় করত, মাড়োয়ারীরা এই মালা বিভিন্ন স্থানে চালান করত।[৩২] বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলগুলি সমৃদ্ধশালী। সেখানে উৎকৃষ্ট মানের তসর জন্মাত। বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি স্থানে তসরের বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছিল এই তসরকেই কেন্দ্র করে। বিষ্ণুপুর হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ রেশমবস্ত্রের কেন্দ্রস্থল। এই বস্ত্র শিল্পও মাড়োয়ারীরা হস্তগত করে নেয়। তাঁতিরা কাপড় বুনে তা মারোয়াড়ীদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় বিকল্প কোন বিক্রয়কেন্দ্রের অভাবে। মাড়োয়ারীরা সেই বস্ত্র বোম্বাই, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে উচ্চদরে বিক্রয় করতেন।[৩৩] সুতোর ব্যবসা ক্ষেত্রেও মাড়োয়ারীরা একচেটিয়া আধিপত্য বসায়। জেলায় প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার

সুতো আমদানি হত তাঁর মধ্যে মাড়য়ারী ব্যবসায়ীরাই সাত লক্ষ টাকার সুতো আমদানি করত।[৩৪] বাঁকুড়ার প্রয়োজনীয় বস্ত্র যদি এত বেশী পরিমান আমদানি করা না হয়ে এখানে তৈরি হত, তবে এখানকার মানুষদের দারিদ্র খানিকটা লাঘব হত।

মাড়োয়ারীদের বিভিন্ন ধরনের সামজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনকেও স্থানীয় বাঙালীরা ভাল চোখে দেখে নি। এইধরনের প্রতিষ্ঠান গুলি যথা, ধর্মশালা- গোশালা সমাজের উপকারের চেয়ে মাড়োয়ারীদের নিজেদের স্বার্থ কেই বেশী সুরক্ষিত করেছিল বলে স্থানীয় বাঙালিদের মনে হয়েছিল। রামানুজ কর লিখেছিলেন -"গোশালাটি কেবল দুগ্ধবতী গাভীর জন্যই হইয়াছে। ষাঁড় গুলিকে দাদন করা হয় কেন? গোশালায় যে দুগ্ধ হয় তাহা মাড়োয়ারীরাই ব্যবহার করে। এই গোশালা স্থাপনে ভগবতী দেবীর যতটা না উপকার হয়, তাঁর চেয়ে মাড়োয়ারীদের অনেক বেশী উপকার হয়। কারন বিশুদ্ধ দুগ্ধের জন্য তাদের আর ভাবতে হয়না। গোশালাটীর খাঁটী দুগ্ধে তাহাদের দেহ স্থুল হচ্ছে আর বাঁকুড়ার হতভাগ্য বাঙালীরা তা থেকে বঞ্চিত।"[৩৫]
গোশালার ফান্ডের টাকাও মাড়োয়ারীদের হাতেই থাকত, যা তাঁরা ব্যবসার মূলধন হিসেবে ব্যবসায়ীদের ধার দেওয়া হত। কাজেই এই গোশালাটি ছিল একটি ব্যাঙ্কের মত। বাঙালীরা টাকা ধার নিলে তার কাছে অতিরিক্ত সুদ নেওয়া হত।[৩৬]

ঔপনিবেশিক আমলে বাঁকুড়া নামক ছোট্ট শহরটি হয়ে উঠেছিল মাড়োয়ারীদের কাছে 'Land Of Oppertunity', যেখানে তাঁরা ভাগ্যানুসন্ধানের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁর সৎব্যবহার করেছিলেন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় যেখানে মাত্র চারটি বাজার ছিল, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, রাজগ্রাম ও বড়জোড়া। কিন্তু এর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই অসংখ্য ছোট বড় গঞ্জ বা ব্যবসাকেন্দ্রের জন্ম দিয়েছিল। এর কারন ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যপকতা বৃদ্ধি, যা মাড়োয়ারীদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ছাড়া সম্ভবপর হত না। তাদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের ফলেই বাঁকুড়া জেলার সাথে অন্যান্য দূর অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বাণিজ্যিক তৎপরতার ফলে বাঁকুড়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের ভৌগোলিক সম্প্রসারণ ও সেই সঙ্গে আমদানী-রপ্তানী দ্রব্যের তালিকাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রকৃতিগত রূপান্তরের পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বাঁকুড়ার সামগ্রিক অর্থনীতিতে এই বাণিজ্যের প্রভাব ছিল এক বারেই সীমিত। কারন এই সমৃদ্ধ অর্থনীতি শুধুমাত্র শহর বাঁকুড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জেলায় মাড়োয়ারীদের কার্যকলাপের নানান সমালোচনা করা হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাঁকুড়ার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাঁকুড়াজেলার শিক্ষার উন্নতিতে তাঁরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তাদের সামাজিক কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয়। মাড়োয়ারীদের কার্যকলাপের ফলে বাঁকুড়া জেলার অর্থের নির্গমন ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে রামানুজ কর যে অভিযোগ করেছেন তা সার্বিকভাবে সত্য নয়। একথা সত্য যে মাড়োয়ারীদের আগমনের ফলে ব্যবসা অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছিল কিন্তু সাথে সাথে এটাও ঠিক যে নব্য অর্থনৈতিক বিকাশ বাঁকুড়া জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবাহের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এই নব্য আর্থ-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বাঁকুড়াজেলায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশে সহায়ক হয়। এই শ্রেণীই ছিল 'নব্য বাঁকুড়া'র উত্থানের মুখ্য কারিগর।

Reference:

1. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি,* পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া, তৃতীয় সংস্করণ,২০১৬, পৃ. ১৩
2. 'তদেব', পৃ. ৪৬৩
3. শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, "*বাঁকুড়া শহরের গোড়ার কথা*", ধারাবাহিকভাবে হিন্দুবাণী পরিকায় প্রকাশিত (১৩৭১-৭২ বঙ্গাব্দ)
4. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২
5. 'তদেব', পৃ. ৪৬৩
6. *বাঁকুড়া পরিচয়,* চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯১
7. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩
8. শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত
9. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩
10. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩
11. শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত
12. শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত
13. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪
14. শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত
15. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *অতীত বাঁকুড়ার আর্থচিত্র,* পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া,২০১২, পৃ. ১৭
16. তদেব', পৃ. ২৭
17. রামানুজ কর, *বাঁকুড়া জেলার বিবরণ,* বাঁকুড়া,১৩৩২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৭
18. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি,* পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া,তৃতীয় সংস্করণ,২০১৬, পৃ. ৪৬৪
19. 'তদেব', পৃ. ৪৬৫
20. 'তদেব', পৃ. ৪৬৬
21. রামানুজ কর, *বাঁকুড়া জেলার বিবরণ,* পৃ. ১১৭
22. 'তদেব',পৃ. ১১৮
23. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি,* পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া,তৃতীয় সংস্করণ,২০১৬, পৃ. ৪৬৪
24. সুব্রত রায়,*বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* ১৯২৩-১৯৪৭, পৃ. ১৭৯

25. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি*, পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া, তৃতীয় সংস্করণ,২০১৬,পৃ.৪৬৬
26. 'তদেব', পৃ. ৪৬৫
27. সুব্রত রায়, পুর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩
28. শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী,*বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি*, পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া, তৃতীয় সংস্করণ,২০১৬, পৃ. ৪৬৭
29. 'তদেব', পৃ. ৪৭০-৭১
30. শেখর ভৌমিক, *বাঁকুড়া একটি ছোট শহরের নির্মান*, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ১৯৯
31. শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত
32. রামানুজ কর, *বাঁকুড়া জেলার বিবরণ*, পৃ. ১০২
33. 'তদেব', পৃ. ১০২
34. 'তদেব', পৃ. ১০০
35. 'তদেব', পৃ. ১০৩
36. 'তদেব', পৃ. ১৭৬-১৭৭

লেখক পরিচিতি

শোভন ঘোষাল, পিএইচ. ডি, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী শিক্ষক, বামুনতোড় উচ্চবিদ্যালয়, বাঁকুড়া
Nadadihi. Salboni, Bankura (W.B.) PIN: 722102
Mobile: 9635296893/9475806907
Email: sovanghosalbu@gmail.com

CC BY NC